Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অচিনরাগিণী : হৃদয়ের অন্য জানালা

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনীষা চৌধুরী
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.6
Pages	87-118
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অচিনরাগিণী : হৃদয়ের অন্য জানালা

মনীষা চৌধুরী

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যিক জীবন খুব দীর্ঘ নয়। লিখেছেনও অল্প। তবু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম আজ অবশ্য-আলোচ্য। এর কারণ এই মাত্র নয় যে, বিষয় ও বিন্যাসে তিনি তাঁর শিল্পকর্মকে নিরীক্ষাধর্মী করে তুলেছিলেন। সেইসঙ্গে লক্ষণীয় তাঁর বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি। পাঠক মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কলম ধরেননি। জনপ্রিয়তা লাভ কখনো তাঁর অভীষ্ট ছিল না। রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায়, নিঃসঙ্গ জীবনে আন্তরিক সাধনায় যা তিনি সত্য বলে জেনেছিলেন তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর সব লেখা সমান শিল্প-সাফল্য লাভ করেছে এমন নয়। তবে তাঁর কোন লেখাই অসতর্ক লেখা নয়। বরং প্রতিটি লেখাই সুচিন্তিত সুনির্ধারিত।

ঢোঁড়াই চরিত মানস ও সত্যিভ্রমণ কাহিনীর কথা বাদ দিলে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রতিটি উপন্যাস মূলত ব্যক্তির অন্তর্জগতের কথা। এমন কি জাগরী, চিত্রগুপ্তের ফাইল-এর মতো উপন্যাস, যেখানে রাজনীতিই প্রধান বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে; সেখানেও রাজনীতি নয়, ব্যক্তির মনোজাগতিক টানাপোড়েন তুলে ধরাই ছিল সতীনাথের লক্ষ্য। তাঁর শেষ দিকের তিনটি উপন্যাস সংকট, অচিন রাগিণী ও দিগভ্রান্ত-তে বহির্জগৎ ছেড়ে সতীনাথ যেন পুরোপুরি অন্তর্জগতের দিকে মন দিয়েছেন।

অচিন রাগিণী উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। বই হিসাবে প্রকাশিত হবার আগে এটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে ছাপা হয়েছিল, ১৩৬০ সালের ২ মাঘ থেকে ১৩৬১ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত আঠারোটি সংখ্যায়।

"পিলে, নতুন দিদিমা আর তুলসী তিনজনকে নিয়ে এই টান-ভালবাসার গল্প। শোনা পিলের মুখে।" –এই নতুন ধরনের গল্প বলার স্টাইলে সতীনাথ যেন পাঠককে আমন্ত্রণ জানান হৃদয়রহস্যের আলো আঁধারে ঘেরা এমন এক জগতে, যা আমাদের একান্ত পরিচিত হয়েও ঠিক যেন পরিচিত নয়। ঠিকেদার বাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী দেখন ঠাকুরণ হলেন পিলে তুলসীর পাড়া সম্পর্কের নতুন দিদিমা। নতুন দিদিমাকে ঘিরে এই দুই মাতৃহীন কিশোর জড়িয়ে পড়ে টান ভালবাসার জগতের রহস্যময় টানাপোড়েনে। যার বিবরণ আমরা পাই এ গল্পের কথক এবং অন্যতম প্রধান চরিত্র পিলের মুখে।

পিলে এই আখ্যান ভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মধ্য-যৌবন পর্যন্ত তার জীবনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ লেখক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। নাটকীয় যা কিছু, তা ঘটেছে তুলসীর জীবনে। কিছুটা নতুন দিদিমার জীবনেও। নতুন দিতিমার প্রতি পিলের প্রবল আকর্ষণ; নতুন দিদিমার তুলসীর প্রতি পক্ষপাতিতত্ব এবং তুলসীর নতুন দিদিমার ভালবাসায় 'একমাত্র' হবার ব্যাপারে আপোষহীন মনোভাব। এই তিনটি ধারায় পিলের মনোজগৎ আন্দোলিত হয়েছে।

পিলে তার নাম নয়। ছোটবেলায় পেটে পিলে হয়েছিল বলে বন্ধু তুলসী এই নামকরণ করেছিল। ছোটবেলায় বেশি রোগে ভুগত বলে ছোটাছুটি করার চেয়ে ঘরে বসে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিল পিলে। ফলে বড় হয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও পিলের ক্ষমতা ছিল সূক্ষ্মভাবে দেখবার এবং গভীরভাবে চিন্তা করার। তাই নতুন দিদিমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনে পিলে লক্ষ করে তাঁর আদর করার বিশেষভঙ্গিটি। পিলে তুলসী দুজনেই মুগ্ধ হয়ে যায় তাঁর সুন্দর সুন্দর কথায়। তবে তুলসী যখন দিদিমার গায়ের 'হিং হিং গন্ধে'র কথা বলে তখন নিজেকে যেন একটু ছোট মনে হয় পিলের।

> সে তো জানে না গন্ধটা কেমন। তাকে তো উনি অমন করে কাছে টেনে নেন নি তুলসীর মতো। (পৃ-৮)

নতুন দিদিমার প্রতি অপরিসীম মুগ্ধতার পাশাপাশি প্রথম দিন থেকে পিলের মনে একটা বেদনাবোধ জন্ম নেয়। যার কারণ তুলসীর প্রতি নতুন দিদিমার স্নেহাধিক্য। তবে এই গোপন ঈর্ষাভরা বেদনার কথা সে কোনদিন কাউকে জানায়নি। এ তার একলার জগৎ। পিলে চায় তুলসীর মত নতুনদিদিমাকে 'তুমি' করে ডাকতে। ইচ্ছে করে নতুন দিদিমা তাকেই সবেচেয় ভালবাসুন। কিন্তু হৃদয়বাসনার অকুণ্ঠ প্রকাশ ঘটানো তার স্বভাব নয়। সে স্নেহের কাঙাল। আবার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে ষোলআনা। ভিক্ষুকের মত প্রার্থনা করতে পারে না অথচ জুলুম করে কেড়ে নিতেও চায় না। বরং উপরে উপরে একটা উদাসীন ভাব সে দেখাতে চেষ্টা করে। নতুন দিদিমা তাই বুঝতে পারেন না মৃদু স্বভাবের, কথায় অপটু পিলে কতখানি স্নেহ চায় তাঁর কাছ থেকে। বরং স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত দিয়ে বলেন, 'তুই তো তবু মায়ের বদলে পিসিকে পেয়েছিস্।' পৃ. ৫১।

তুলনাটা তুলসীর সঙ্গে। পিলে তাই মরমে মরে যায়। বিভিন্ন ঘটনায় যতবার পিলে অনুভব করে যে নতুন দিদিমা তুলসীকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসেন ততবার সে বেদনা বিদ্ধ হয়।

ভাল করে স্কুল ফাইনাল পাস করে পিলে ডাক্তারি পড়তে চলে যায় ডিব্রুগড়ে দিদির কাছে। নতুন দিদিমাকে ছেড়ে যেতে তার বুক ফেটে যায়। কর্তব্যকে মেনে নিয়ে তবু সে চলে যায়। যাবার সময় দিদিমার আদর ভরা কথা 'পাগলা কোথাকার' ছিল ডিব্রুগড়ে তার সাথী। আর ছিল নতুন দিদিমার চিঠি। ঐ চিঠি আসবার দিন ছাড়া অন্যদিনগুলো পিলের মানবিক অসাচ্ছন্দ্যে ভরা থাকে। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দিয়ে পিলে ছুটিতে বাড়ি আসে। কিন্তু তার এতদিন ধরে গড়ে তোলা নতুন দিদিমার স্নেহ-ভালবাসার জগতে প্রত্যাবর্তনের মধুর স্বপ্ন প্রথম দর্শনেই ভেঙে যায়। আগেকার সেই নতুন দিদিমাকে পিলে যেন খুঁজে পায় না। ডিব্রুগড় যাবার আগে পিলে তুলসী নতুন দিদিমা মিলে টান ভালবাসার যে জগৎ নির্মাণ করেছিল পিলের মনে হয় সেখান থেকে সে নির্বাসিত হয়েছে। সেখানে তার ভূমিকা আজ নিতান্তই তৃতীয় ব্যক্তির।

পিলে তুলসী বন্ধু হলেও সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। ছেলেবেলা থেকে ডানপিটে, জেদী তুলসী নিজের পছন্দ-অপছন্দ-অধিকার কাউকে জানাতে দ্বিধা করে না। স্বাধীনভাবে চলে সে। অল্প বয়সে মা মারা গেলে পিতার শাসনহীন স্নেহপ্রশ্রয় তাকে বেপরোয়া করে তোলে। এক নতুন দিদিমা ছাড়া অন্য কোথাও তুলসীর কোন বন্ধন, কোন আনুগত্য ছিল না। তাই নতুন দিদিমার ব্যাপারে তুলসী বরাবর অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর পিলের মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সে নতুন দিদিমার স্নেহের অংশ দিতে রাজী নয়। সেই ছোটবেলায় বাটি সংক্রান্ত এক ঘটনায় এটা পিলে প্রথম অনুভব করেছিল।

স্কুলে যাবার সময় পিলে তুলসী প্রতিদিন একটা গাছের নিচে একত্র হত। একদিন ভোরে পিলে গাছতলায় একটা কাঁসার বাটি দেখতে পায়। দু'বন্ধু মিলে ঠিক করে যে কাটিটা তারাদের। আসলে এত ভোরে নতুন দিদিমার কাছে যাবার এ এক ছুতা মাত্র। দুজনেই ছুটতে শুরু করে।

> যে নিজ হাতে করে নতুন দিদিমাকে বাটিটা দেবে, আর যে কেবল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, দুজনের মর্যাদা এক নয়, একথা দুজনেই বিনা চেষ্টায় বুঝে গিয়েছে। (পৃ-৪৬)

তুলসী পিলের হাত থেকে বাটিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। পিলে কিছুটা অবাক হয়।

> পিলেকে দুর্বল জেনে নেতাসুলভ উদারতায় তুলসী সবসময় খানিকটা আশকারা দিত। আজ পিলে প্রথম লক্ষ্য করল এর ব্যতিক্রম। নতুন দিদিমার কাছে পৌঁছবার বেলা সে দুর্বল পিলেকেও তাচ্ছিল্য করতে পারে না। (পৃ. ৪৭)

স্কুলে তুলসী সেদিন পিলেকে গোলাপী রেউড়ি কিনে খাওয়ায়। পিলের মনে হয়–

> বাটি কাড়াকাড়ির সংকীর্ণতা ঢাকবার জন্য নয় তো? অন্যদিন হলে পিলের কিছুই মনে হত না! কিন্তু তুলসীর সব 'ইয়ে' আজ পিলে ধরে ফেলেছে ! (প- ৪৮)

ডিব্রুগড় থেকে ফিরে পিলের মনে হয় তুলসীর সেই প্রবণতা বড় হয়ে আরো বেড়েছে। আর বেদনভরা বিস্ময়ে সে লক্ষ করে নতুন দিদিমা তুলসীকে নিয়ে আলাদা একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন। দু'বছর অদর্শনের পর যেন আগন্তুক সেখানে। প্রথম দেখা হবার সময় তুলসী বলেছিল নতুন দিদিমা পিলেকে তিনটার সময় যেতে বলেছেন। পিলে অবাক হয়। "এত ঘড়ি দেখে ইন্টারভিউ দেওয়া তিনি কবে থেকে আরম্ভ করলেন ? ডিব্রুগড়ে যাবার আগে পর্যন্ত তো তাঁর সঙ্গে রাত একটার সময় বিনা নোটিশে দেখা করা চলত! ' (পৃ–৭৮) দুষ্টুমি করে পিলে বেলা দু'টোর সময় গিয়ে হাজির হয় একেবারে নতুন দিদিমার হবিষ্যি ঘরে। বিস্মিত পিলে লক্ষ্য করে যে নতুন দিদিমা তাঁর পাতের এঁটো ভাত আর পোরে ভাজা খেতে দিয়েছেন তুলসীকে। তার হঠাৎ আগমনে তাঁরা দুজনেই চেষ্টা করে ব্যাপারটা চাপা দেবার। পিলে অবাক হয়, দুঃখও পায়।

> তুলসী বদলেছে। সবচেয়ে বড় কথা নতুন দিদিমা বদলেছেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা! ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কেন ? লুকোচুরির ভাব কেন ? তুলসী ঘড়ি ধরে তিনটের সময় নতুন দিদিমার হয়ে টাইম দেয়, অথচ নিজে এসে বসে থাকে তখন থেকেই। নতুন দিদিমা জানতে পেরে সামলে নেবার চেষ্টা করেন। পোরের ভাজার ব্যাপারটাতে ও আগাগোড়া যোগসাজশের গন্ধ! অভাবনীয় ! (পৃ–৮১)

কিন্তু পিলে নতুন দিদিমার উপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। সে জানে,

> তার আসল ব্যথা তুলসীর প্রতি নতুন দিদিমার পক্ষপাতিত্ব, কিন্তু সে ভাবতে চেষ্টা করে যে, তার ব্যথা অন্য কারণে–নতুন দিদিমার মধ্যে একটা লুকোচুরির ভাব দেখে; সে নতুন দিদিমাকে পেতে চায় না, জানতে চায়; পোরে ভাজার ব্যাপারটা এক রহস্যপুরীর দুয়ার খুলে দিয়েছে তার সম্মুখে। (পৃ–৮৪)

নিজের সাথে নিজে কথা বলে পিলে। বিশ্লেষণ করে নিজের মনকে।

> বৈজ্ঞানিক হবার জন্য তাকে বাবা তৈরি করেছিলেন ছেলেবেলা থেকে। বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ কৌতূহল নিয়ে সে জানতে চায় নিছক জ্ঞানের জন্য,

নিজেকে এর মধ্য থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে সে সমস্তটা জানতে চায়। (পৃ-৮৫)

পিলে খবর পায় তুলসী মদ খাওয়া শুরু করেছে। সন্ধ্যাবেলা ফুদি মিস্ত্রির বাড়িতে বসে খায়। পিলে আশ্চর্য হয়। "সে তো আগে কোনো কথা লুকোত না পিলের কাছে।" অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে পিলে অনুভব করে তুলসী আর নতুন দিদিমা দুজনে মিলে পর করে দিচ্ছে তাকে। কিন্তু,

কেন ? পিলের মনটাই এমন যে গভীর বেদনার মধ্যেও সে প্রশ্ন করতে ভোলে না 'কেন'? 'হয়তো', 'তবে কি' দিয়ে বহু মনগড়া ব্যাখ্যা খাড়া করে দেখে; কিন্তু ভুল হতে পারে ভেবে, সুনিশ্চিত উত্তরে পৌঁছতে ভয় পায়। (পৃ-৮৯)

পিলে আসাতে তাদের 'টেললেম ক্লাবে'র আড্ডা জমে ওঠে। তুলসী ও সন্ধ্যার পর ক্লাবে হাজির থাকে। ফলে নতুন দিদিমা সন্ধ্যার পর একলা বোধ করেন। একদিন তুলসীর সামনেই তিনি পিলেকে রাতে তার কাছে গল্প করতে আসতে বলেন। বদরাগী তুলসী অমনি ফোঁস করে ওঠে। নতুন দিদিমার শঙ্কাকুল মিনতিভরা দৃষ্টিতে পিলে পড়ে নেয় তাঁর অন্তরের ভাষা।

আমি কি ওকে আসতে বলেছি; আমি আসতে বলছি তোকে। অযথা হিংসে করছিস ওর উপর।.....তুই রাগ করবি জানলে কি আর আমি ওকে আসতে বলি ?.....(পৃ-৯০)

পরের দিন একাদশী। নতুন দিদিমার আজ রান্না নেই। গল্প করার লোভে দিদির ছেলেটাকে কোলে নিয়ে পিলে নতুন দিদিমার বাড়ি যায়। কিন্তু ঘরে ঢুকে সে অবাক হতেও ভুলে যায়। "নতুন দিদিমা পা ছড়িয়ে বসে আর তুলসী তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে।" কিন্তু গুলটিদির ভাব দেখে সে বোঝে এমন ঘটনা নতুন নয়। খোকা বাড়ি যাবার জন্য বিরক্ত করলে নতুন দিদিমা পিলেকে বলেন খোকাকে বাড়ি রেখে আবার আসতে। পিলে রাজী হয় না। পিসিমা বকবেন। সে রাতে আসতে চায়। কিন্তু নতুন দিদিমা স্পষ্ট প্রত্যাখান করেন তাকে। "গরমকালের একাদশীতে ও বেলা কি আর আমি বসে গল্প করতে পারি ?" পিলে বোঝে তুলসীর মন রাখতে নতুন দিদিমা তাকে ফিরিয়ে দিলেন। নিজেকে নিস্পৃহ দর্শক রাখার সংকল্প পিলের ভেস্তে যায়। দুঃখবোধ গ্রাস করে তাকে।

তুলসী চিরকালেই বখাটে মার্কা ছেলে। পড়াশুনা হল না। ছোটবেলা বাবাকে দেখেছে নেশা করতে, ফুদি মিস্ত্রির অবর্তমানে তার বাড়িতে রাত কাটাতে। সে

জানত বাবার শাসন করার জোর নেই। তাই সে তামাক খেয়ে ধরা পড়লেও বাবা তাকে কিছু বলবেন না। যৌবনে পা দেবার পর তুলসী স্বাভাবিকভাবে আরো অমিতাচারী হয়ে ওঠে। তার মদ খাওয়া নিয়ে পাড়ার লোক ছি ছি করে। তুলসী পরোয়া করে না। কিন্তু হবু ডাক্তার পিলেকে পাড়ার লোক, বন্ধু-বান্ধব বিশেষ করে নতুন দিদিমা যখন বাড়তি খাতির দেখান তখন তুলসী সহ্য করতে পারে না। একদিন পিলেসহ সব বন্ধুদের সে সিদ্ধি খাইয়ে নেশা করিয়ে দেয়। যেন নিজের সমপর্যায়ে আনতে চায়। পিলে আশ্চর্য হয় "তুলসীর মন স্বাভাবিক উদারতা ভুলেছে" দেখে।

ডিব্রুগড়ে ফিরে আসে পিলে। পড়াশুনার পাশাপাশি নতুন দিদিমাকে নিয়ে চলে তার একান্ত ভাবনা চিন্তা।

> যতদিন যায় ততই বোঝা যায় যে, তার মনের ভিতরে নতুন দিদিমা ভরা আছেন কতকগুলি কথার মধ্যে.....তার নিবিড় সম্বন্ধ আসলে নতুন দিদিমা মানুষটির সঙ্গে নয় তাঁর বলা কথার সঙ্গে.....নতুন দিদিমা যদি বাবা হতেন, তাহলে বোধহয় তাঁর কোন আকর্ষণ থাকত না পিলের কাছে।.....(পৃ-৯৯)

পিসিমার অসুখ খবর পেয়ে পিলেকে হঠাৎ দুদিনের জন্য বাড়ি আসতে হয়। পিলে খুব খুশি। জলপানির টাকা থেকে পিসিমার জন্য একজোড়া থান ধুতি কিনে নেয় সে। আর নতুন দিদিমার জন্য কেনে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। বই পেয়ে নতুন দিদিমার আনন্দ যেন ধরে না। তুলসী কিন্তু চটে আগুন হয়। সে তার মায়ের পুরনো মহাভারতখানা নতুন দিদিমাকে দিয়েছিল কিন্তু তিনি নেননি। সেইসব কথা তুলে অভদ্রের মত ঝগড়া শুরু করে তুলসী। এই কাণ্ডের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয় পিলের। সব মিলিয়ে তার বিশ্রী লাগে।

এবার ডিব্রুগড় ফিরে এসে পিলে নতুন দিদিমার চিঠি পায় অনিয়মিতভাবে। পিসিমার চিঠিতে খবর পাওয়া যায় তুলসী অনেক দিন ধরে নিখোঁজ। ডাক্তার হয়ে বাড়ি ফিরে আসবার পর নতুন দিদিমার মুখে পিলে বিস্তারিত জানতে পারে। তুলসীর স্বভাবচরিত্রে পাড়া প্রতিবেশী সর্বদাই সমালোচনা মুখর ছিল। একবার নতুন দিদিমার সঙ্গে তুলসীকে জড়িয়ে কোন কু-কথা পাড়া থেকে শুনে এসেছিল 'তারা'। তাই নিয়ে সে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলে। তুলসীকে তারা কোনকালেই দেখতে পারে না। এবার সে নতুন দিদিমাকে স্পষ্ট বলে দেয় তিনি যেন তুলসীকে বাড়িতে ঢুকতে না দেন। তারার উপর রাগ করে নতুনদিদিমা সত্যিসত্যি তুলসীকে ও বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করে দেন। অপ্রত্যাশিত আঘাতে তুলসী প্রথমটায় নির্বাক হয়ে যায়। তারপর গভীর অভিমানে বাড়িঘর ছেড়ে গ্রাম

ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। তার উষর পৃথিবীতে অমৃতের উৎস ছিলেন নতুন দিদিমা। আকৈশোর সে অমৃতধারায় ডুবে থেকে অধিকারের জোর বেড়ে গিয়েছিল তুলসীর। অকস্মাৎ সে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে স্থির রাখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

পিলে অবাক হয়ে দেখে তুলসী চলে যাওয়ায় তার যতটা দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল ততটা সে হয়নি। বরং দুঃখের চেয়ে কৌতূহলের পরিমাণই বেশি। সে বোঝে তার উচিত তুলসীকে খুঁজে বের করা। কিন্তু উৎসাহ পায় না। এমনকি তার ভয় হয় পাছে নতুনদিদিমা তাকে অনুরোধ করেন তুলসীকে খুঁজে আনতে। এসব ঝামেলায় সে জড়িয়ে পড়তে চায় না। স্পর্শকাতর মনের পাশাপাশি পিলের ছিল একটা হিসাবী মন। যে কিনা বুঝে সুঝে চলার পক্ষপাতী। তাই অন্তর্জগতের টানাপোড়ন তার বাইরের জীবনকে কখনো তছনছ করে দিতে পারেনি। বরং অন্তরের বিক্ষেপ যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সে জন্য সে সদাসচেতন। তুলসীর প্রতি নতুনদিদিমার পক্ষপাতিত্বে পিলে দুঃখ পেয়েছে। তার মন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে নতুন দিদিমার সঙ্গে সম্পর্কছেদ করেনি সে। পড়ায় অমনোযোগী হয়নি। পিলে নিজেই তার মনের বিশ্লেষণ করছে,

> তার মনের এই দিকটা সাংসারিক অভিজ্ঞতার দিক, বুঝেসুঝে চলার দিক; তার নতুন দিদিমার দিকটা ভাবপ্রবণতার দিক, বেহিসাবী দিক। (পৃ-১০১)

আশ্রয়গৃহের মাউইমাকে খুশি করতে পিলে জল পানির থেকে দুটি টাকা দিয়ে প্রণাম করেছে এমনি তার হিসাবী ভাবনা। নতুন দিদিমাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে ছবিওয়ালা চণ্ডীমঙ্গল দিয়ে। সেই সঙ্গে পিসিমার জন্য কিনেছে খান ধুতি। দিদির শ্বশুরবাড়ির তরঘোর অনুরোধ উপেক্ষা করে নতুন দিদিমার কাছে থাকবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় পিলে নিজের গ্রামে ডাক্তারী শুরু করেছিল। আবার মাউইমাদের খুশি করতে বিয়ে করে তাদেরই এক নিকট আত্মীয়াকে। পিলের হিসাবী আর বেহিসাবী মনের মধ্যে 'অষ্টপ্রহর দ্বন্দ্ব' বেধেছে ঠিকই। তবে আবেগ কখনো তার বৈষয়িক বুদ্ধিকে অভিভূত করতে পারেনি। তাই পিলের জীবন কখনো তুলসীর মতো অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। হারায়নি বাহ্যিক ভারসাম্য।

পিলে ঠিকাদার বাবুর বড় ছেলে তারার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ডিসপেনসারী দিয়ে বেশ সংসার গুছিয়ে বসবারও অনেকদিন বাদে পাওরঙ্গী নামে এক স্ত্রীলোক তুলসীর চিঠি নিয়ে আসে। তুলসী তার কাছেই থাকে। পাওরঙ্গী সরসৌনি গ্রামের নাট্টিন। দীর্ঘদিন পরে ধোকর ধারা পুলের কাছে দেখা হয় দুবক্কুর। সরসৌনি গ্রামের নাটদের সর্দার এবং তাদের মালিক হরখচন্দ সিং-এর

মর্যাদার লড়াইয়ে সর্দারের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন হরখচন্দ। তাই সর্দারকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তুলসী অনুরোধ করে, সর্দারকে বাঁচাবার চেষ্টা করুক পিলে। পিলের চেষ্টায় অবশ্য কাজ হয় না। সর্দার তাঁর পক্ষে উকিল রাখতে রাজী হন না। দশ বৎসরের জেল হয় তাঁর। পিলের কাছে তুলসীর সংবাদ শুনে নতুনদিদিমার প্রশ্ন আর থামে না। সবশেষে বলেন "হ্যাঁরে, তোর গোস্ত (দোস্ত, নতুনদিদিমার পরিহাসের নামকরণ) আমার কথা কিছু বলল না ?" পিলের মনে হয় "এইটিই আসল প্রশ্ন। এতক্ষণকার বাকি সব প্রশ্নগুলো অবান্তর"।

কিছুকাল পরে তুলসীর অসুস্থতার সংবাদ নিয়ে আসে সরমৌনি গ্রামের একটি ছেলে। নতুন দিদিমাকে সংবাদ দিতে গিয়ে পিলে দেখে বাড়ির আবহাওয়া থমথমে। ঠিকাদারবাবুর মৃত্যুর পর থেকে ও বাড়িতে নতুনদিদিমার গুরুত্ব কমছিল। তারার বিয়ের পর বৌ হয়ে ওঠে সংসারের কর্ত্রী। চাকর বাকরে আগে তাঁকেই ডাকত মাইজী এখন ডাকে বৌকে। সেদিন 'মায়ের গায়ের সোনা' দিয়ে বৌ-এর জন্য কবচ বানানো নিয়ে তারা নতুনদিদিমাকে অপমান করে। সেই সময় পিলে তুলসীর খবর নিয়ে গেলে নতুন দিদিমা। মনস্থির করে ফেলেন এ বাড়ি ছেড়ে তিনি চলে যাবেন কমলপুর। তার পেটের ছেলে কেষ্ট ওখানে ওভারসিয়ারের চাকরি করে। পিলের গাড়িতেই যাবেন। পিলের–

> হিংসা হয় কেষ্টর উপর। সে তো কোনোদিন ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। আজ হঠাৎ কেষ্ট কী করে 'ফাস্ট' হয়ে যাচ্ছে? অন্যায় কথা না ? (পৃ–১৫৬)

তুলসীর অসুখের কথাটাও যেন পিলের কাছে তখন গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু পিলের আরেক দফা অবাক হওয়া বাকী ছিল। নতুন দিদিমা সরমৌনি গ্রামে গাড়ি থামাতে বলেন। তারপর গাড়ি থেকে নামেন গঙ্গাজলের ঘাট আর মটকার থান নিয়ে।

> আমি ততক্ষণে দেখি যদি আহ্নিকটা সেরে নিতে পারি এই গাছতলায়। তুই গ্রামের মধ্যে গিয়ে গাড়িতে করে গন্ধ পাতাকে (তুলসী। নতুন দিদিমার দেওয়া নাম) নিয়ে যায়। (পৃ–১৫৭)

পিলে এবার সব স্পষ্ট বুঝতে পারে।

> মুহূর্তের মধ্যে চিরকেলে 'সেকেন' পিলে, 'সেকেন' থেকে 'থাড়'-এ নেমে গেল। .....তুলসী ফাস্ট, কেষ্ট সেকেন, পিলে থাড়। (পৃ– ১৫৭)

অসুস্থ তুলসী কিন্তু নতুন দিদিমার আহ্বানে সাড়া দেয় না। বলে–"সে আর হয় না রে পিলে," এ ভয় পিলে আগেই করেছিল। "ফাস্ট, সেকেন, থাড় হবার চিরকেলে" হিসাব আর পিলের মনে আসে না। তার চোখে ভেসে ওঠে আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জ্বল নতুনদিদিমার মুখখানা। কেমন করে সে তাঁর সামনে যাবে ? কী জবাব দেবে তাঁকে ?

পিলে তুলসী আর নতুনদিদিমার মধ্যেকার এই টান ভালবাসা, এর স্বরূপ সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বিষয়টিকে একবার নতুনদিদিমার দিক থেকে দেখার চেষ্টা করা যায়।

স্বামীকে ঘিরে স্ত্রীর যে স্বপ্ন-সাধ থাকে, ঠিকেদার বাবুর কাছ থেকে তার কিছুই পূরণ হয়নি নতুনদিদিমার। দুজনের বয়সের ব্যবধান এর একটা বড় কারণ। তবে ঠিকাদারবাবুর আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিও অনেকখানি দায়ী। আগের পক্ষের ছেলেমেয়েরা কী মনে করবে এই চিন্তায়, অপরাধবোধে পীড়িত ঠিকাদারবাবু না পেরেছেন নতুনস্ত্রীকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিতে, না দিয়েছেন তাঁকে সংসারের কর্ত্রী-র মর্যাদা। নতুন দিদিমার কাছে স্বামীর সংসার তাই চিরকাল 'এদের সংসার' হয়ে থেকেছে।

> আমাদের আবার বিয়ে।! না ছাই! ছেলেপিলে তো কুকুর বিড়ালের ও হয়।.....তার সংসার; তারই সব; বাজার খরচ চাইতে হবে চোরের মতো। আমার কি আর অন্য দশ জনের মতো ? (পৃ–১৩)

স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর স্বাভাবিক অধিকারটুকু চাইতে নতুনদিদিমার কুণ্ঠা। স্বামীকে 'তুমি' করে ডাকতে পর্যন্ত পারেননি কোনদিন। নিজের জীবনে যে সাধ পূর্ণ হয়নি তারই স্বাদ নিতে বুঝি তিনি পাড়ার নববিবাহিতা মেয়েদের কাছ থেকে ভাব-ভালবাসার গল্প শুনতে ভালোবাসেন। সপত্নী-পুত্র 'তারা' তাঁকে মুহূর্তমাত্র সহ্য করতে পারে না। এ সংসারে তিনি যে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত তাও সে বুঝিয়ে দেয় প্রথম দিনই "মা ও যা ঘটিও তাই"–এই বাক্যে। দেখন ঠাকুরণের বিবাহিত জীবনে পাওনার খাতায় কেবল জোটে শূন্য। এই শূন্যতা, বৈরী সংসারের অসহ একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই হয়তো বাল্যজীবন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ স্মৃতিবিধুরতা! পিলে-তুলসী ভালোবাসে বাংলাদেশের গল্প। নতুনদিদিমাও বলতে ভালোবাসেন। গল্প বলার ছলে নতুনদিদিমা ফিরে যান তাঁর বাল্য কৈশোরের মধুস্মৃতি মাখা বাংলাদেশের সেই গ্রামে। সৎ ছেলে তারা তাঁকে ভালোবাসেনি। নিজের পেটের ছেলের জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করতে তিনি ভয় পেয়েছেন। তাই ভালোবাসার এবং ভালবাসা পাবার সাধ মেটাতে তিনি কাছে টেনে নেন মাতৃহীন পিলে তুলসী শুধু নয়, পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের।

কিন্তু প্রথমাবধি তুলসী সম্পর্কে নতুন দিদিমার পক্ষপাতিত্ব, তুলসী প্রথমবার নেপাল থেকে ফিরে এলে তার আশ্রয়দাতা দাজুর মা-বোন সম্পর্কে নতুন দিদিমার কৌতূহল, তাঁর কোলে মাথা রেখে তুলসীর 'আরাম নেওয়া'র অভ্যাস তুলসীকে তাঁর পাতের এঁটো খাওয়ানো নিয়ে পিলের সঙ্গে লুকোচুরি, পাতরঙ্গীর শরীরে দুর্গন্ধ কিনা এ এনিয়ে তাঁর একাধিকবার প্রশ্ন করা আমাদের যেন দ্বিধাগ্রস্ত করে। আর নতুনদিদিমার সন্দেহপরায়ণ প্রতিবেশীদের মত আমরা যখন এই প্রশ্নের মুখোমুখি হই যে যুবক তুলসীর গভীর রাত অবধি নতুন দিদিমার কাছে এমন কী প্রয়োজন থাকতে পারে যে সে সময়ে পিলের আসবার সম্ভাবনাতে পর্যন্ত সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অথবা তা থেকে বঞ্চিত হতে হলে নিজেকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের দিকে। পিলের মত 'হয়তো' 'তবে কি' প্রশ্নের জবাব আমাদের ঠেলে দিতে চায় অতি সরল এই সিদ্ধান্ত যে, এই অসমবয়সী দুই নারীপুরুষের মধ্যে যৌন-আকর্ষণ ছিল। এবং এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন প্রবন্ধময় তরুণ মুখোপাধ্যায়,

> অচিন রাগিণী উপন্যাসে পিলে, তুলসী ও নতুন দিদিমার সম্পর্কগুলি আপাতদৃষ্টিতে বাৎসল্যময় হলেও তারই অন্তরালে রয়েছে অবরুদ্ধ কামনার তাপ।.....। বয়ঃসন্ধির কৌতূহল, ভালোবাসা, বিস্ময়, শ্রদ্ধা মিশিয়ে নতুন দিদিমাকে তারা যেভাবে দেখেছে, ধীরে ধীরে তা আরো পরিণতি লাভ করেছে। নতুন দিদিমা ও ইডিপাস কমপ্লেক্স অনুভব করেছেন অবচেতনে।
>
> সতীনাথ ভাদুড়ী : বস্তুবাদী চিন্তাও অনিকেত মন, ত্রৈমাসিক 'অন্যস্বর' জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮৫. পৃ. ৬.

অচিন রাগিণীর নতুনদিদিমা সম্পর্কে অরুণা হালদার বলেছেন –

> তাঁর স্বামীর প্রতি তাঁর আনুগত্য আছে কর্তব্য আছে। কিন্তু তাঁর সুপ্তপ্রেম জাগ্রত হয়েছে একটি বয়োকনিষ্ঠ কিশোরকে নিয়ে।
>
> সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী : মনস্তত্ত্বের আলোকে
>
> সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পৃ. ২০৩

টান-ভালোবাসার নিয়ামক হিসাবে অবচেতন যৌনচেতনাকে দায়ী করেছেন এই প্রবন্ধকারদ্বয়।

কিন্তু এমন সরল সমাধান তৈরির জন্যই কি সতীনাথ আমাদের সামনে রহস্যময় হৃদয়রাজ্যের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন ? অতি সরল কোনও চটজলদি সিদ্ধান্ত নিলে সতীনাথের উপর আমাদের অবিচার করা হবে।

প্রথমে আসা যাক নতুন দিদিমার তুলসীর প্রতি পক্ষপাত প্রসঙ্গে। নতুন দিদিমা যতই বলুন যে তিনি 'তুল্যের তুল্য' করে দিয়েছেন, মানুষের পক্ষে সেটা অসম্ভব-প্রায়। অন্ধ ভালোবাসা এবং যুক্তিতর্কহীন বিরাগ–এ মানুষের স্বাভাবের অঙ্গ। তাই সৎমাকে 'তারা' কিছুতেই সহ্য করতে পারে না আর নতুনদিদিমা ইচ্ছা করলেও তুলসীর প্রতি তাঁর স্নেহধারা ফিরাতে পারেন না। সমদৃষ্টি কথাটি হয়তো শুধু অভিধানেই মেলে। 'জাগরী'র মা নীলুর চেয়ে বিলুকে বেশি ভালোবাসেন। 'দিগ্‌ভ্রান্ত'তে মেয়ের প্রতি বাবার এবং ছেলের প্রতি মায়ের ঘোষিত পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। ঢোঁড়াইয়ের হৃদয় আসনে সর্বদাই বাসিয়া প্রথম মাগিয়া দ্বিতীয়। তাই পিলে ও অন্যান্যদের চেয়ে নতুনদিদিমার হৃদয়ে 'তুলসী ফাস্ট, অনেক উচুঁতে ফাস্ট" এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এছাড়া বিনীতের চেয়ে দুর্বিনীতের প্রতি, নীরব আত্মত্যাগকারীর চেয়ে সরব আত্মপ্রতিষ্ঠাকামীর প্রতি, ভাল ছেলের চেয়ে সমাজ যাকে খারাপ ছেলে বলে খেতাব দিয়েছে তার প্রতি মেয়েদের টান থাকে বেশি। মাতৃহীন নিঃসঙ্গ তুলসী, বেপরোয়া-বেহিসাবী তুলসী, খারাপ ছেলে তুলসী তাই সুশীল-সুবোধ ভাল ছেলে হিসাবী পিলের চেয়ে বেশি নম্বর পায় নতুন দিদিমার কাছে।

অন্যের হৃদয় অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষ সর্বদা চায় প্রথম হতে। ভালোবাসার যতরকম সম্পর্ক হতে পারে, স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধা-বন্ধুত্ব সব ক্ষেত্রেই মানুষ প্রথম হতেই চায় দ্বিতীয় হতে চায় না কেউ। সন্তান যদি বোঝে মা তার চেয়ে অন্য কোন ভাইবোনকে বেশি ভালোবাসেন তবে সে দুঃখ পায়। আবার মা যদি দেখেন বাবার প্রতি সন্তানদের টান বেশি তবে তিনিও আহত হন। 'জাগরী'র মা যখন জানলেন যে বিলু তার জ্যাঠাইমাকে মা বলে ডাকে তখন তিনি ঈর্ষাতুর না হয়ে পারেন নি। 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসে বাবা মেয়েকে, মা ছেলেকে ভালোবাসতেন। কিন্তু একটা বিপ্রতীপ টানাপোড়েনও ছিল পিতা-পুত্র ও মাতা-কন্যায় এর কারণও ঈর্ষা। আর স্ত্রীর প্রতি সুবোধবাবুর অভিমানের বড় কারণ ছিল এই যে অতসীবাবার জীবনে স্বামীকে ছাপিয়ে ধর্ম হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়। শাশুড়ী-বধূ চিরন্তন বিবাদের কারণটিও এই। এতদিন ছেলের ভালবাসায় মা ছিলেন প্রথম আজ তিনি দ্বিতীয় হয়ে যাচ্ছেন। এই অবচেতন বেদনাবোধ প্রায়শ তাঁকে নববধূর প্রতি বিরূপ করে তোলে। তুলসী যদি বিয়ে থা করে সংসারী হত এবং নতুন দিদিমার স্নেহ দাক্ষিণ্যের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলত তবে তিনি নিঃসন্দেহে বেদনাহত হতেন। তুলসী পাতরঙ্গীকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলে মেয়েটি সম্পর্কে নতুন দিদিমার একই সঙ্গে কৌতূহল ও বিরাগ তারই প্রমাণ দেয়। তাঁর উপর রাগ করে তুলসী নেপাল চলে যায়, ভালোবাসা পাবার অধিকার নিয়ে পিলের সাথে তুলনা করে দুঃখ পায়, ঝগড়া করে। এই যে একজনের জীবনে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে-ওঠা—এতে আছে

গভীর সন্তুষ্টি। যাতে নতুনদিদিমা তাঁর 'কেবল জোড়াতালি' সংসার থেকে পাওয়া শূন্যতা অনেকটা ভুলতে পেরেছিলেন। তুলসী চলে যাওয়াতে সেই শূন্যতা বুঝি আবার সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল নতুন দিদিমার কাছে। তবু নতুনদিদিমার উপর রাগ করে তুলসী নিরুদ্দেশ হয়েছে। এ তথ্যে বেদনা থাকলেও আত্মতৃপ্তির অবকাশ আছে। কারণ এর মূলে আছে তাঁর প্রতি তুলসীর গভীর ভালোবাসার অনুভব সঞ্জাত অভিমান। কিন্তু নতুনদিদিমা যে এত মনের দৃঢ়তা দেখিয়ে এক পরিচিত সংসার ত্যাগ করে এলেন দুই. লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করে কেষ্ট কী মনে করবে তা চিন্তা না করে তুলসীকে কমলপুরে নিয়ে যেতে চাইলেন তিন. মমতা আর শুশ্রূষা দিয়ে তাঁর আদরের গন্ধ পাতাকে সারিয়ে তুলবেন বলে, আর তুলসী তাঁকে ফিরিয়ে দিল, তা যে কারণেই হোক, এতে আছে নতুন দিদিমার হেরে যাবার, 'সেকেন' হয়ে যাবার জ্বালা। নতুন দিদিমাকে এই আঘাতটুকু পেতে আমরা উপন্যাসে দেখি না। তবে বেদনা-ভারাক্রান্ত পিলের স্বগতচিন্তার মধ্যদিয়ে তা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি।

> .....বন্ধ্যা অস্পষ্টতার মধ্যে শুধু জ্বলজ্বল করছে একখানি মুখ-গভীর আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত -মুক্তির আনন্দে উদ্দীপিত-শান্ত সাহসে ভরা –অল্প টাকপড়া সিঁথির দুইদিককার কাঁচাপাকা মেশানো চুলগুলি কপালে এসে পড়েছে। মটকার থান পরে তিনি তৈরি হয়ে রয়েছেন তাঁর এতদনি-পর ফিরে পাওয়া গন্ধ পাতাকে কোলে টেনে নেবার জন্য। .....গাড়ি যেতেই যে তিনি ছুটে আসবেন।.....কী করে তাঁর সম্মুখে যাবে ? কী করে বলবে এ কথা তাঁর কাছে ? কী জবাব দেবে তাঁর প্রশ্নের? এরই জন্য তিনি এতদিন ধরে নিজের মনকে তৈরি করেছেন। এত মনের জোর–এত সাহস–কোনো কাজে এল না। (পৃ–১৬০)

ফ্রয়েড-ইয়ং গোষ্ঠীর মতবাদ দিয়ে যত সহজে অসমবয়সী এ তিন নারী পুরুষের ভালোবাসার ব্যাখ্যা দেয়া চলে, তত সরল নয় ব্যাপারটি। মানবহৃদয়ের মৌলিক প্রবণতা নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী গভীরভাবে ভেবেছিলেন। 'দিগ্‌ভ্রান্ত', 'সংকট' এবং অসমাপ্ত উপন্যাস 'জারজ;–এ-তার পরিচয় আছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানবমন, মানব-সম্পর্ককে দেখার চেষ্টা করেছেন সতীনাথ. যেন তিনি মানব হৃদয়ের চোরাকুঠুরির বন্ধ জানালাগুলো খুলতে চেয়েছিলেন এক এক করে। 'অচিন রাগিণী'কে এই প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে হবে। নইলে অচিন রাগিণী আমাদের অ-চেনা হয়েই থাকবে। [প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলো সতীনাথ গ্রন্থাবলী–৩ (সম্পাদনা-শঙ্খ ঘোষ। নির্মাল্য আচার্য. অরুণা প্রকাশনী) থেকে নেয়া হয়েছে।]

বাংলা সীরাত-সাহিত্য : উদ্ভব ও বিকাশ ধারা

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
মুহাম্মদ রুহুল আমীন

'সীরাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ হল নিয়মাবলী, জীবন-যাপন পদ্ধতি, মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের অবস্থা, জীবনচরিত ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে সীরাত বলতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী তথা জীবনচরিতকে বুঝায়। সীরাত সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বৈজ্ঞানিক ও বিশুদ্ধপন্থায় সংরক্ষিত জীবনচরিত যথার্থ বর্ণনায় সুনিপুণ ও সূচারুরূপে উপস্থাপন করা হয়। *Dictionary of Islam* গ্রন্থে বলা হয়েছে, *Kitabus siyar is the title given to a history of the establishment of Islam, hence as Siyar means a historical work on the life of prophet Mohammad (s.) or any of his companions, or of his successors.*[১]

তাই সীরাত-সাহিত্য বলতে সেই বিজ্ঞানময় সাহিত্যকে বুঝায় যাতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনচরিত অত্যন্ত সুন্দর, সুনিপুণ ও সুচারুরূপে আলোচনা করা হয়।

মানব-জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যমণ্ডিত। বৈচিত্র্যময় মানব জীবনে নানামুখি অবস্থা, কর্তব্য ও দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়। মানব ইতিহাসে যেসব মনীষী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং যাঁদের অবদান মানব-সমাজে সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। কিন্তু একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল পুরুষের জীবনে সকল স্তরের মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ অনুপস্থিত।[২] কেননা, তাঁরা বিশেষ কাল ও বিশেষ জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে এ ধরাধামে আগমন করেছিলেন। তাই তাঁদের চরিত্র ও জীবনবৃত্তান্ত পরবর্তীকালের মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিল না। আর হযরত মুহাম্মদ (সা) যেহেতু সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, তাই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মানুষের অনুসরণযোগ্য আদর্শ। এজন্য তাঁর চরিত্র ও জীবনের ঘটনাবলী সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ী হিসেবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত। তিনি বিশ্বের রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।[৩] তাঁর জীবানাদর্শ সর্বকালের, সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। মহানবী (সা)-এর সীরাতে মানব-জীবনের সকল স্তরের উত্তম আদর্শ

প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি একজন বিশ্বস্ত (আল আমিন) চরিত্রবান সমাজ সংস্কারক যুবক, স্নেহময়ী পিতা, একজন দায়িত্বশীল স্বামী, একজন সফল মহান রাষ্ট্রনায়ক, সফল সেনানায়ক, মহান বিজয়ী, ন্যায়পরায়ণ বিচারক, দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয়কারী, সফল প্রশিক্ষক, সঠিক পথপ্রদর্শক, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, বিশ্বস্ত বন্ধু ও প্রতিবেশী, সাহসী বীর, সফল রাজনীতিবিদ ইত্যাদি-সহ সর্বক্ষেত্রে একজন আদর্শবান মহামানব। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"[৪] এই অনুপম আদর্শের কারণেই মহানবী (সা) বিশ্ব-ইতিহাসে সর্বাধিক আলোচিত ও প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। শুধু মুসলিম পণ্ডিতগণই নন, বহু অমুসলিম গবেষক, পণ্ডিতও তা অকপটে স্বীকার করছেন।[৫] ধর্মবীর ও কমবীর মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনকথা, কর্ম ও শিক্ষা সমসাময়িক লিখন ও স্মৃতিপরম্পরা উভয় উপায়েই অতি বিশ্বস্তরূপে সংরক্ষিত হয়েছে।[৬]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনচরিত রচনার সমসাময়িক মূল উৎস হল আল কুরআন, রাসূল (সা)-এর সুন্নাত, সন্ধিপত্র, দলীল-পত্রাদি ও সমসাময়িক আরবি কবিতা। "আল্লাহর কিতাব হযরতের জীবনের শেষ তেইশ বছর ব্যাপী তিনি যেভাবে জিবরাঈল মারফত পেয়ে লিপিবদ্ধ করান এবং যেভাবে তিনি আদ্যোপান্ত গুছিয়ে সাজিয়ে মুখস্ত করান, তাঁর ইন্তিকালের পর ঠিক সেভাবেই গ্রন্থাকারে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে এবং সেভাবেই তা বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে একথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি বিচারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।"[৭]

ইসলাম এবং এর প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও চরিত্র আলোচনায় কুরআনই প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। কুরআনই তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তাঁর চিন্তা, মত ও কর্ম, এক কথায় তাঁর সমগ্র চরিত্রের বিশ্বস্ত দর্পণ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ দ্বারা তাঁর জীবন ও কর্মকে বিচার করতে কুরআনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি।[৮]

মহানবী (সা)-এর জীবনও চরিত্র আলোচনার দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য উৎস সুন্নাহ্ বা হাদীস। তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই তাঁর উক্তি, কার্য ও সম্মতিসূচক ঘটনার বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছেন। আবার অনেকে তা লিখে রেখেছেন। লিখন-স্মৃতি পরম্পরায় হাদীস প্রচারিত হয় এবং হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সযত্ন বাছাইয়ের ফলে সহীহ্ হাদীসসমূহ *সিহাহ্ সিত্তাহ্* নামে পরিচিত ছয়খানি গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ সব হাদীসে মহানবী (সা)-এর জীবনের সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

"সমসাময়িক রাজন্যবর্গের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণপত্রাদি এবং বিজিত বা বন্ধুভাবাপন্ন শক্তিবর্গের সঙ্গে রসূলে পাক (সঃ)-এর সন্ধিপত্রাদিও হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইহুদী, খ্রীস্টান ও বিভিন্ন গোত্রের স্বার্থ সংরক্ষণে সনদাদি এবং হাস্‌সান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক, কা'ব ইবনে যুহায়ের ও আল '-আশ প্রমুখ সমসাময়িক কবিগণের কবিতায় তাঁর জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"[৯]

"হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে আরবী ভাষায় হযরতের ধারাবাহিক জীবনী সংকলন আরম্ভ হয়। এ কাজে যাঁরা ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে উরওয়া ইবনে যুবায়ের (মৃত ৯৪ হিঃ) ও তাঁর ছাত্র ইমাম যুহ্‌রী (৫২-১২৪ হিঃ) সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষতঃ হযরতের অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ে ইমাম যুহ্‌রী যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তা গ্রন্থকারে না পাওয়া গেলেও তার বিষয়বস্তু পরবর্তী বিভিন্ন সীরাত রচয়িতার গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মূসা ইবনে উকবা ও আবূ মা'শর এবং শেষ দিকে আবূ ইসহাক (মৃত ১৮৮ হিঃ) এবং আল মাদাইনী সীরাত রচনা করেন। তাঁদের গ্রন্থগুলো দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে তাঁদের উল্লেখ দেখা যায়। হযরতের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত যেসব সীরাৎ গ্রন্থ রক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে (১) মুহম্মদ ইবনে ইসহাকের (মৃত ১৫২ হিঃ) 'মাগাযী', (২) ইবনে হিশামের (মৃত ২১৩ হিঃ) 'সীরাতু রসূলিল্লাহ্', (৩) মুহম্মদ ইবনে উমর আল ওয়াকিদীর (১৩০-২০৭ হিঃ) 'কিতাবুল মাগাযী', ও (৪) তাঁর সেক্রেটারী ইবনে সা'দের (মৃত ২৩০ হিঃ) 'আৎ-তবকাতুল কুররা' এবং (৫) ইবনে জরীর তবরীর (২২৪-৩১০ হিঃ) 'তারীখুল উমর অল-মুলুক' সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ।"[১০]

উক্ত আরবি মূল উৎসসমূহ অবলম্বনে বিভিন্ন ভাষায় বহু সীরাত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। বাংলা ভাষাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী। সুতরাং এ ভূ-খণ্ডের পুঁথিকার, কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক প্রমুখ সমাজের মানুষ মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনী নিয়ে সর্বদা পুঁথি, কবিতা, প্রবন্ধ, গযল, না'ত ইত্যাদি রচনা করে আসছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সূর্যসম ব্যক্তিত্ব প্রতিটি মুসলিম সাহিত্যসেবীর দৃষ্টিতে অনেকভাবে ধরা পড়েছে। সকলেই নিজ-নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিরাট চরিত্রকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

বাংলা হচ্ছে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। এ ভাষাতেই রচিত হয়ে থাকে আমাদের সাহিত্য। তবে এ ভাষায় কে, কোথা থেকে, কখন সর্বপ্রথম সীরাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।[১১] এ সম্পর্কে জানতে

হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলায় ইসলাম প্রবেশের সূচনাপর্ব জানা আবশ্যক। ড. হাসান জামান ও ড. মুহম্মদ এনামুল হক-সহ আরো অনেকের মতে, খ্রিস্টীয় ৬৩৪ শতাব্দীতে (১৩ হি.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলেই বাংলায় মামুন, হামেদ উদ্দীন ও আবূ ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ সাহাবীর আগমন ঘটে।[১২] এ সময় থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এ দেশের মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। দু-একটি কলিতে, গানের আসর বন্দনাতে, ধূয়া গানে[১৩] এবং মর্ম কবিতায়[১৪] মুহাম্মদ (সা)-এর নাম পাওয়া যায়। তাও আবার আরবি, ফারসি, তুর্কি ও সংস্কৃতের সংমিশ্রণে।[১৫] কেননা, বাংলা সাহিত্যের বয়স মাত্র ১০০০ বছর।[১৬] এর শুরু আবার ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এ যুগকে আদি, প্রাচীন, হিন্দু, বৌদ্ধযুগ বলা হয়। এ যুগে বৌদ্ধ রচনাবলী প্রাধান্য পায়।[১৭] তাও আবার স্বল্প প্রতুল্য। কেননা, এদেশে ছাপাখানার প্রবেশ ঘটে অনেক পরে। সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলিতে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে।[১৮] বাংলা ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ার পূর্বে সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করা যেমন ছিল ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য তেমনি সে-সব সংরক্ষণের জন্যও ছিল না কোন যথোপযুক্ত গ্রন্থাগার। বাংলাদেশে প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভ করে বরিশালে ১৮৫৪ সালে।[১৯]

অন্যদিকে "ইংরেজ ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে মুসলমানদের যা কিছু পুঁথি ছিল তা ধ্বংস হয়ে যায়।"[২০] তাই মুহিউদ্দীন খান বলেছেন, "তৎকালে বড় বড় লাইব্রেরী এবং প্রকাশনার দায়িত্বে ছিল হিন্দুরা। তারা তাদের পুঁথিগুলো সংরক্ষণ করত এবং মুদ্রিত করত। ফলে মুসলমানগণ সীরাতের এক বিশাল ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত। তাঁর মতে, রাসূল (সা)-এর জীবনীর উপরই ১২০০ পুঁথি ছিল। যার কিয়দংশ ব্যতীত সবগুলোই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাও নিঃশেষ হয়ে যেত আব্দুল করীম সাহিত্যবিশারদ যদি এ সময় না সংরক্ষণ করতেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা থেকেই একক প্রচেষ্টায় যদি এতগুলো পুঁথি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তা হলে সারা বঙ্গে কত পুঁথি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যার ইয়ত্তা নেই।"[২১] কয়েক বছর আগে খালেদ মাশুকে রাসূল নামে জনৈক ব্যক্তি তার কাছে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী সম্বন্ধীয় বেশ কয়েকখানা কলমী পুঁথি রয়েছে বলে জানান।[২২]

সাহিত্য সংরক্ষিত না থাকলে তার ইতিহাস নিরূপণ করা দুষ্কর। কেননা, সাহিত্যের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে রচিত গ্রন্থাবলী। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেসব রচনাই ছিল পুঁথিনির্ভর। ছাপার ব্যবস্থা ছিল না, মূল রচনা পুঁথির অনুলিখন ছিল সীমিত, অনুলেখকরাও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না। অন্যপক্ষে জলো আবহাওয়াদির প্রতিকূলতায় প্রাচীন পুঁথি তথা মূল লেখকের রচনা অনেক সময়েই রক্ষা পায়নি। ফলে আমাদের হস্তগত প্রাচীন কাব্যের পুঁথির লিপিকার মূল

কাব্য রচনার অনেক পরবর্তী। এমন ক্ষেত্রে কেবল পুঁথির লিপিকারের উপরে একান্তভাবে বা প্রধানভাবে নির্ভর করে সাহিত্যিক নির্মিতির ইতিহাস নিরূপণ করতে গেলে অনেক সময়ে বিভ্রান্তির হাত এড়ানো কঠিন হয়।[২৩]

পুঁথি-সাহিত্যের উপর গবেষণা করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন পণ্ডিত নবী-চরিত বিষয়ক পুঁথির সংখ্যা নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষ করে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩); ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯); ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২); ড. আহমদ শরীফ; ড. আনিসুজ্জামান; ড. মুহম্মদ আবু তালিব; সুলতান আহমদ ভূঁইয়া; আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন; ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন প্রমুখ গবেষক পুঁথি-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক গবেষণার মাধ্যমে পুঁথি-সাহিত্যের বিশেষত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর রচনা সম্ভারের যে পথ নির্দেশ দিতে পেরেছেন, তাতে আমরা সঠিক তথ্যের অনেক কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।[২৪] তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন :

(ক) বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায় (প্রাকতুর্কি আক্রমণ যুগ, বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত যুগ, আনুমানিক ৭৫০-১২০০ খ্রি.)।

(খ) বাংলা সাহিত্যের মধ্য পর্যায় (তুর্কি আক্রমণ পরবর্তীযুগ, আনুমানিক ১২০১-১৮০০ খ্রি.)।

(গ) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায় (য়্যুরোপ প্রভাবিত যুগ, ১৮০১-বর্তমান যুগ পর্যন্ত)।[২৫] একে আদি, মধ্য ও আধুনিক কালে বিভক্ত করা যেতে পারে।

খলিফা ওমর (রা)-এর সময় অথবা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর হতে বঙ্গে ফকীর-দরবেশদের দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হলে[২৬] অথবা সীরাত সাহিত্য লেখা হলেও তা ব্যাপক আকারে ছিল না। যা কিছু ছিল তা যত্নের অভাবে বা ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে কালের করাল গ্রাসে তলিয়ে যায়। কিন্তু তুর্কিদের আগমনের কারণে বঙ্গের লোক ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে লেখাপড়া ও কলমের ব্যবহার শেখে।[২৭] হিন্দুরা যখন তাদের দেবতা নিয়ে প্রশংসামূলক পুঁথি লেখে আর গানের আসর বন্দনা করে দেবতার নাম নিয়ে তখন মুসলমানদের হৃদয় নাড়া দিয়ে উঠে। অপর দিকে তুর্কিদের নিকট রাসূল (সা)-এর জীবনীমূলক ঘটনা শুনে ও বই দেখে মুসলমানগণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে রাসূল (সা)-এর উপর বই লেখা শুরু করে। কেউবা তুর্কি ভাষা থেকে অনুবাদমূলক পুঁথি লেখেন। তাঁদের এই পুঁথি বা বইগুলো স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। একদিকে তাদের সাহিত্যের উপর হিন্দুপ্রভাব অপর দিকে তুর্কি প্রভাব পড়ে। ফলে এদেশে এক মিশ্র

সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এ মধ্যযুগেই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩/৪ খ্রি. বাংলা দখল করে নেয়। সারা বাংলায় মুসলমানদের অধিকার বা প্রভাব বিস্তৃত হতে প্রায় এক শত বছর লেগে যায়।[২৮]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই মধ্য যুগের আরম্ভ গণ্য করা যেতে পারে।"[২৯] ধারণা করা হয়, এ সময় থেকেই রাসূল (সা)-এর আলোচনা বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে চলতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে 'মুহাম্মদ' শব্দটি কখন প্রথম ব্যবহৃত হয়, অদ্যাবধি গবেষকগণ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে না পারলেও ধারণা করা হয়, বাংলা সাহিত্যে 'মুহাম্মদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অথবা তের শতকের রামাই পণ্ডিতের পুঁথি 'শূন্যপুরাণ'-এর 'কলেমা জাল্লাল বা রুদ্র বাক্য' (নিরঞ্জনের রুষ্মা)-তে। যেমন,

ব্রহ্মা হৈল মঁহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।[৩০]

এরপর চলতে থাকে পুঁথি সাহিত্যের গতিধারা। অপর বর্ণনায়, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পাদক শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক ও Folk liturature বা ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা সংগ্রাহক রেভারেন্ড লালবিহারীর মতে, বাংলায় পুঁথি লেখার শুরু হয় সম্ভবত ১১৭৬ (খ্রি.) সাল থেকে আর এর শেষ হয় ইংরেজদের আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত অথবা আধুনিক কাল পর্যন্ত।[৩১] কেননা, তুর্কিদের সাথে এল কাগজ, কিতাব, বই আর য়্যুরোপীয়দের সাথে এল ছাপাখানা, পত্র-পত্রিকা, মুদ্রিত বই। এ সবগুলো দিয়েই আধুনিক যুগের পত্তন হল।[৩২]

অতএব, সীরাত সাহিত্যের অথবা পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তিগত আলোচনায় বুঝা যায় যে, বঙ্গে ইসলামের যাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে সীরাত সাহিত্যেরও যাত্রা অব্যাহত রয়েছে যার প্রমাণ হয়তো বহুকাল পরে পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত প্রমাণ পেশ করেছেন, তা অনেকটা কল্পনীয়, যাকিছু প্রমাণ সাপেক্ষ তা মেলে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' থেকে আর রামাই পণ্ডিত ছিলেন ১৩শ শতকের শেষ এবং ১৪শ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ের একজন পণ্ডিত। সে-হিসেবে ১৪শ শতককেই রাসূল (সা)-এর জীবনী বা সীরাত সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য কাল হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

বাংলা সীরাত সাহিত্যের ধারা

বাংলা সাহিত্যে হযরত (সা)-এর প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলীর প্রকাশের একটি বিবর্তনগত ধারা পরিলক্ষিত হয়। বটতলার পুঁথি থেকে এ বিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইছুফ জোলেখা' থেকে পুঁথি

সাহিত্যে না'ত-ই-রাসূলের প্রয়োগ হতে থাকে। তখন হামদ ও না'ত দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করার একটি প্রবণতা চলছিল।

ষোড়শ শতকে সাইয়েদ সুলতান পুঁথি-সাহিত্যে হযরতের জীবনভিত্তিক কাব্য রচনা করেন। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতকে গিরিশচন্দ্র সেন গদ্যসাহিত্যে হযরতের জীবনী লেখার প্রয়াস পান। বিংশ শতকের প্রারম্ভে আধুনিক কাব্যে হযরতের জীবনী রচনা করেন কবি মোজাম্মেল হক। এ বিবর্তনের ধারা নিম্নরূপ পরিগ্রহ করেছে :[৩৩]

না'ত	পুঁথি-সাহিত্য	গদ্য+পদ্য-সাহিত্য	আধুনিক সাহিত্য
১৪শ শতক	১৬শ শতক	১৯শ শতক	২০শ শতক

উক্ত বিবর্তনগত ঐতিহাসিক ধারাকে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যে হযরত চরিতমালাকে পাঁচটি যুগ বা পর্বে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. সূচনা পর্ব (১৫৮৫-১৮৮৫) : ৩০০ বছর;

খ. শেখ আব্দুর রহিম ও মশাররফ যুগ (১৮৮৬-১৯২০) : ৩৪ বছর;

গ. মোস্তফা চরিত যুগ (১৯২১-১৯৪১) : ২০ বছর;

ঘ. বিশ্বনবীর যুগ (১৯৪২-১৯৭০) : ২৮ বছর;

ঙ. স্বাধীনতা-উত্তর বর্তমান যুগ (১৯৭১- বর্তমান সময় পর্যন্ত)।

ক. সূচনা পর্ব (১৫৮৫-১৮৮৫)

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ চরিত্র ও মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে এ সময় যারা তাঁর উপর গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সৈয়দ সুলতান, 'নবীবংশ', 'রসূল বিজয়', 'শবে মেরাজ', 'ওফাতে রাসুল', হায়াত মামুদ, 'জঙ্গনামা', 'সর্বভেদবাণী', 'হিতজ্ঞানবাণী', 'আম্বিয়া বাণী', গিরিশচন্দ্র সেন, 'হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত', অতুলকৃষ্ণ মিত্র, 'ধর্মবীর মুহাম্মদ (১ম ও ২য় খণ্ড')।

খ. শেখ আব্দুর রহিম ও মশাররফ যুগ (১৮৮৬-১৯২০)

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যখন একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রচনায় সাহিত্য ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় তখন মুসলমানগণ স্বভাবতই তাদের নবীর সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য সাহিত্যকর্ম রচনায় ব্রতী হন। এ সময় হযরত (সা)-এর

চরিত্রের উপর যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজন হচ্ছেন: শেখ আব্দুর রহিম, 'হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি', মীর মশাররফ হোসেন, 'মৌলুদ শরীফ', 'বিষাদসিন্ধু', 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'মদীনার গৌরব', মোজাম্মেল হক, 'হযরত মুহাম্মদ', শেখ ফজলুল করীম, 'পরিত্রাণ', রামপ্রাণ গুপ্ত, 'ইসলাম কাহিনী', 'হযরত মোহাম্মদ', মুহাম্মদ দাদ আলী, 'আশেকে রাসূল', সুফী মধু মিয়া, 'শান্তিকর্তা হযরত মোহাম্মদ', মুহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'মানব মুকুট ও নূরনবী', সারা তয়ফুর 'স্বর্গের জ্যোতি', শেখ মুহাম্মদ জমিরুদ্দীন, 'বাঙ্গালা গযল', 'শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও পাদ্রীর ধোকাভাঞ্জন', 'মাসুম হযরত মোহাম্মদ (সা)'।

গ. মোস্তফা চরিত যুগ (১৯২১-১৯৪১)

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর মুসলমানগণ যখন নিজেদের ঐতিহ্য মহিমায় বিকশিত হওয়ার দুর্দম প্রয়াস পাচ্ছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে যখন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে আকরম খাঁর মোস্তফা চরিতের মত একটি কালজয়ী গ্রন্থের প্রকাশ ছিল স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী ঘটনা। তাই মোস্তফা চরিত বাংলা ভাষায় রসূল (সা) প্রাসঙ্গিক রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এ যুগের উল্লেখযোগ্য হযরত (সা) চরিতকারগণ হচ্ছেন, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মোস্তফা চরিত', তসলিমুদ্দিন আহমদ, 'সম্রাট পয়গম্বর', কাজী নজরুল ইসলাম, 'জুলফিকার', খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ, 'ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ', মোবিন উদ্দীন আহমদ, 'নবী শ্রেষ্ঠ', মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'মরুভাস্কর', ফজলুর রহীম চৌধুরী, 'মেশকাত শরীফ ও বোখারী শরীফ'।

ঘ. বিশ্বনবীর যুগ (১৯৪২-১৯৭০)

ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য যখন এ দেশের প্রতিটি মানুষ সচেতনভাবে জাগ্রত হল এবং প্রতিটি মুসলমান ইসলামী ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নিজেদের আত্মবিকাশের জন্য একটি সর্বজনীন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছিল, তখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর একটি সর্বজনীন জীবনচরিত রচিত হওয়ার পক্ষে ছিল অনুকূল অবস্থা। গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী তারই ফলশ্রুতি। মুসলমানদের সেই স্বপ্নসাধ কাঙ্ক্ষিতরূপে সফল না হলেও বিশ্বনবীর যুগোপযোগী বর্ণনার জন্য তা একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল গঠন করতে পেরেছিল। এ পরিমণ্ডলে যারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন : গোলাম মোস্তফা, 'বিশ্বনবী', 'মরুদুলাল',

ফজলুল করিম, 'আদর্শ মানব', ব্রজসুন্দর রায়, 'ইসলাম গৌরব', সুফী জুলফিকার হায়দার, 'ফাতেহা-ই-দায়াজদাহম', আ.ন.ম, বজলুর রশিদ, 'মরুসূর্য', কাজী আবুল হুসাইন, 'আমার প্রিয়নবী', 'আল আমীন', আব্দুল খালেক, 'সাইয়েদুল মুরসালিন', কাজী আফসার উদ্দীন, 'মোহাম্মদর রসূলুল্লাহ', ফররুখ আহমদ, 'সিরাজাম মুনিরা', ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'শেষ নবীর সন্ধানে', মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, 'মানুষের নবী', বন্দে আলী মিয়া, 'আমাদের নবী', রওশন ইজদানী, 'খাতামুন নবীঈন', মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ' 'নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ', আহসান হাবীব, 'আমাদের শেষ নবী', ইবরাহীম খান, 'ইসলাম সোপান', 'ছোটদের মহানবী', কাজী আবদুল ওদুদ, 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম', গোলাম মকসুদ হিলালী, 'হযরতের জীবননীতি'।

ঙ. স্বাধীনতার উত্তর বর্তমান যুগ (১৯৭১- বর্তমান যুগ)

স্বাধীনতা উত্তরকালে হযরত চরিতের ক্রমবর্ধমান প্রকাশনা লক্ষ করা যায়। যেমন, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 'জগৎগুরু মুহাম্মদ (সাঃ)', 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ', মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, 'মানব মর্যাদায় মহানবী', মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, 'অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (সা)', 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী ও ইসলাম', আসকার ইবনে শায়খ, 'মহা বিজয়', শেখ সামস্ উদ্দীন আহমদ, 'হেরা পর্বতের সেই কোহিনুর', আকবর উদ্দীন, 'মহানবী মুহাম্মদ', মুহি উদ্দীন, 'মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবন ও আদর্শ', 'মরু সুন্দর'।

বাংলা সাহিত্যে হযরত প্রসঙ্গে প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী যাঁরা

(১) বাংলা সাহিত্যে প্রথম না'ত দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেন শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০)। ড. শহীদুল্লাহর মতে, কবি গরীবুল্লাহ্।

(২) বাংলা পুঁথি-কাব্যে প্রথম রাসূলচরিত রচনা করেন সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮)।

(৩) বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রথম হযরত-চরিত রচনা করেন গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৭০ খ্রি.)।

(৪) আধুনিক কাব্যে প্রথম হযরত-চরিত রচনা করেন কবি মোজাম্মেল হক (১৯০৩)।

(৫) বাংলা মৌলুদের প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আব্দুল আলী চৌধুরী (১৮৭৪)।

(৬) হাদীস শাস্ত্রের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৯২)।

(৭) বাংলা সাহিত্যে হযরতের জীবনী লেখক প্রথম মুসলমান শেখ আব্দুর রহিম (১৮৭৭)।

(৮) বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা হযরত চরিত রচনাকারী সারা তয়ফুর (১৯১৬)।

(৯) বোখারী শরীফের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক শামছুল হক ও আজিজুল হক (১৯৭৭)।

(১০) মেশকাত শরীফের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক ফজলুল করীম।

(১১) বাংলায় সর্বপ্রথম সীরাতুন্নবী সংখ্যা বের করার প্রচলন করেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (১৯৬২)।[৩৪]

পুঁথি সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর প্রথমে পুঁথিনির্ভর জীবনী রচিত হয়েছে। ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে কলমি পুঁথিসাহিত্য থেকে তা আরম্ভ হয়। কিন্তু আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩)-এর পূর্বে কোন মুসলমান সেসব পুঁথি সংরক্ষণের চিন্তা ভাবনা করেনি। তৎপূর্বে হিন্দুগণ কেবল তাদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুঁথি সংরক্ষণ করেছিল। ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "কিন্তু ... সংগ্রহের প্রেরণায় মুসলমানদের বাড়ী হইতে মুসলিম পুঁথি সংগৃহীত হইল না। ইহার জন্য বাংলার মুসলমানদের এক বিরাট সম্পদ ধ্বংস হইয়া যাইতে লাগিল। এই সময় মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের আবির্ভাব না ঘটিলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম।"[৩৫]

সুতরাং বাংলা ভাষায় নবীজীবনী কখন লেখা শুরু হয় রক্ষণের অভাবে তা আজও অজ্ঞাত। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলোর নিরিখে চতুর্দশ শতকের শেষভাগ থেকে পুঁথিসাহিত্যে নবীজীবনের চিত্রায়ন শুরু হয়েছে ধরা যায়। তবে হামদ ও না'ত দিয়ে পুঁথি শুরু করার রীতি আরো প্রাচীন।[৩৬] তখন যেকোন কাব্য আরম্ভ করার সময় এ দু'টো বিষয়ের উপর কিছু লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যে সব বই না'ত-ই-রাসূল দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তার বিষয়বস্তু অন্য কিছু। যেমন শাহ মুহাম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০)-এর 'ইছুফ জোলেখা', দৌলত উজীরের 'ইমাম বিজয়' (১৫৬০-৭৫); হাজী মুহাম্মদ (১৫৫০-১৬২০)-এর 'সুরত জামাল' ও 'নুর জামাল', শেখ চাঁদ (১৫৬০-১৬২৫)-এর 'তালিব নামা', মুহাম্মদ খান (১৫৮০-১৬৫০)-এর 'সত্য কলি বিবাদ সংবাদ', দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮)-এর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী', আলাওলের 'তোহফা', 'সপ্ত পয়কর', 'পদ্মাবতি', 'সেকান্দর

নামা', দোনা গাজীর 'সয়ফুল মুলূক বদিউজ্জামাল', শেখ সাদী (১৬৮৪-১৬৯৫)-এর 'গদা মালিক সম্বাদ', হায়াত মামুদ (১৬৮০-১৭৬০)-এর 'সর্বভেদবাণী', 'হিতজ্ঞানবাণী' এবং 'আম্বিয়া বাণী'। সাইয়েদ হামজা (১৭৫৫-১৮১৫)-এর 'জৈগুনের পুঁথি' এবং 'হাতেম তাঈ', গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা', মুহাম্মদ খাতের-এর 'ছহি বড় শাহনামা', কাজী আমিনুল হকের 'জঙ্গ নামা' ও 'জঙ্গে কারবালা', মুন্সি এয়াকুবের 'জঙ্গনামা', আব্দুল গাফফারের 'নূর বক্তা নওবাহার', আব্দুর রহিমের 'গাজী কালু ও চম্পাবতী', আশরাফ উদ্দীনের 'ফাসেদ নামা' ও 'লাইলী মজনু', শাহ আব্দুল করীমের 'মফিদুল ইসলাম', আব্দুল গণীর 'তাজ সোলেমানী', 'শিরী ফরহাদ' ও 'শাহজাদা খসরুর কেচ্ছা', আজমত উল্লাহর 'ফাতেমা জোহরা নামা', মনিরুদ্দীনের 'ছায়েত নামা', আয়জ উদ্দীনের 'জঙ্গে খয়বর' ইত্যাদি। এগুলো রাসূল (সা)-এর জীবনীমূলক বই বলে বিবেচিত না হলেও না'তে রাসূল দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে।[৩৭]

বাংলা গদ্য সাহিত্যে মুহাম্মদ (সা)

বাংলা গদ্যসাহিত্যে এ পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর সীরাতের উপর ছোট বড় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৩৮] তবে দেখা যায়, এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র সেনই প্রথম পথিকৃৎ। মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁকেই বাংলা গদ্যের সীরাতকাররূপে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর 'মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত' গ্রন্থখানির ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা গদ্যে মুসলমানদের লেখা সীরাত গ্রন্থ শেখ আব্দুর রহিমের 'হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। কালের চক্রে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত নবীচরিতের বহু গ্রন্থই বিলীন হয়ে গেছে। সাহিত্যের ইতিহাসও অনেক সীরাত গ্রন্থের ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। যা হোক সেই থেকে বাংলা সীরাত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা চলে আসছে, অদ্যাবধি তা অব্যাহত রয়েছে। প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় আঙ্গিকে পূর্বেই তার কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা সীরাত সাহিত্যে কিছু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের মধ্যে আবুল হুসাইনের 'হযরত মোহাম্মদের জীবনী'; মুহাম্মদ হুসাইন কাসিমীর 'আল আমীন'; খান সাহেব আবেদ আলীর 'হযরত চরিত গ্রন্থ'; কাজী আবুল হুসাইনের 'শেষ নবী'; মহীউদ্দীন আল মাহীর 'স্বপ্নে দেখা দ্বীনের নবী'; ফয়েজ উদ্দীনের 'মিরাজুন্নবী'; রাম মোহন রায়ের 'মহম্মদ চরিত'; মীর্জা সুলতান আহমদের 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)'; আব্দুল ওহাবের 'পাক কোরআনের আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা)'; আব্দুল আজিজ খানের 'শফিউল মুজনেবিন হযরত মুহাম্মদ'; গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৯]

এমনিভাবে বাংলা ভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ইতিহাস সম্পর্কিত রচনা ধারায় এক বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় বিংশ শতাব্দীতে এসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর এই শেষ দশকে এসে বাংলা ভাষায় শুধু সীরাত গ্রন্থের সংখ্যা চারশ' ছাড়িয়ে গেছে।

কাব্য-সাহিত্য

মধ্য যুগের (পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় রাসূল চরিত এবং তদসংক্রান্ত কাব্য তার অন্যতম শাখা। পুঁথি-সাহিত্যের পর গদ্য-সাহিত্য ও কবিতায় মহানবী (সা)-এর জীবনী প্রায় সমসাময়িকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পুঁথি-সাহিত্য কবিতার আদিরূপ হলেও কাব্যিক বিচারে সেগুলো পৃথক সত্তা বহন করে। কবি মোজাম্মেল হক ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে নবীজীবনের উপর কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাব্য ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনায়নের প্রথম পুরুষ হিসেবে তাঁকেই চিহ্নিত করা যায়।[৪০] এ সময়ে রাসূল-প্রাসঙ্গিক কাব্যগুলোকে ছয়টি সাধারণ পর্যায়ে ভাগ করে দেখা চলে। জন্ম রহস্যমূলক, রাসূলবিজয়, মি'রাজ সংক্রান্ত, ওফাত-এ-রসূল কাব্যধারা, জীবনী কাব্য এবং মৌলূদ শরীফ।

বাংলা কাব্যে মুহাম্মদ নামটি প্রথম প্রবেশ করে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই।[৪১] রামাই পণ্ডিতকৃত 'শূন্যপুরাণ'-এর 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় 'মুহাম্মদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। যেমন-

"ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ
বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর।"[৪২]

মধ্য যুগের অধিকাংশ কাব্যই ছিল রূপকাশ্রিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা) প্রাসঙ্গিক কাব্যগুলোর সরাসরি জীবনী বর্ণনার প্রায়সই মুখ্য। তবে ইতিহাসের তুলনায় কল্পনার প্রাবল্য বেশি দেখা যায়। সৈয়দ সুলতান থেকে হায়াত মামুদ পর্যন্ত কবিদের রসূল চরিত কাব্যগুলো তার পরিচয় বহন করছে। সৈয়দ সুলতানের (১৫৫০-১৬৪৮) আগে জৈনুদ্দিন, শা'বারিদ খান, দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান এই তিনজন কবি রসূল প্রাসঙ্গিক কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু সৈয়দ সুলতানই প্রথম 'রসূল চরিত' নামে বিরাট কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এসব কবিই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক উপাদান এসেছে প্রচুর পরিমাণে।[৪৩]

আধুনিক মুসলমান কবিদের রসূল প্রাসঙ্গিক কাব্যে লক্ষ করা যায় প্রধানত আধাত্মিক চেতনা এবং ঐতিহ্য প্রীতি। এ চেতনা এবং অলংকরণ বাংলা কাব্যকে দান করেছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং সমৃদ্ধি। বাঙালি ও ভারতীয় মুসলিম জীবনে ইংরেজ আমলে যে হীনমন্যতা এবং তমিস্রা বিরাজমান ছিল, হযরতের মহাজীবনের আলোকে তা বিদূরিত করার কামনাও জীবনী কাব্যসমূহে প্রচ্ছন্ন ছিল।

বিগত একশত বছরে (১৮৭৪-১৯৬৫) ইসলামের ইতিহাস, পুরাণ এবং ঐতিহ্য নিয়ে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে রসূল জীবনী একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। একালে রচিত মুহাম্মদ চরিত কাব্য ধারা রসূল প্রেমের নিদর্শন। রসূলের জীবনাদর্শ, তাঁর শিক্ষা জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করা একালের কবিদের উদ্দেশ্য। তাছাড়া রসূলের প্রতি গভীর প্রেমে মুগ্ধ এসব কবি ব্যক্তিহৃদয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। মোহাম্মদ সাদেক, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলুল করিম, শেখ জুমন উদ্দীন, দাদ আলী, ফররুখ আহমদ, শাহাদাত হোসেন প্রমুখের কাব্য রসূল প্রেমের আবেগমণ্ডিত। দাদ আলী এবং বজলুল রশিদের কাব্যে সুফীর মরমী চেতনা লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন ইতিহাসের প্রতি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণের মহেন্দ্রক্ষণে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের সমসাময়িক মুসলিম সম্প্রদায়ও সাহিত্যকে বাহন হিসাবে গ্রহণ করে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব জাগরণ ও নব চেতনায়। মুসলিম ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাধক জীবন, রসূলের শিক্ষা ও দর্শনের প্রতি তারা বিশেষ মনোযোগী হলেন। দূর হেরার রাজ তোরণ তাদের প্রেরণার স্থল বলে তারা কল্পনা করেছিলেন। আধুনিক কালের মুহাম্মদ চরিতসমূহ সেই ঐতিহ্যরসে লালিত। আমাদের সাহিত্যে এ জীবনী সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব স্বীকার্য।[৪৪]

মৌলুদ-সাহিত্য

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে অদ্যাবধি মিলাদ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রচিত কাব্য বা গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত বেশ কিছু সংখ্যক রচনা পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর কাব্যমূল্য বা শিল্পমূল্য যাই হোক মহানবী (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতি এদের অন্তরঙ্গে বিদ্যমান। গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাংলায় মৌলুদ শরীফের বই রচিত ও প্রচারিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এসব পুস্তকের প্রকাশকাল নির্ণয় করা কঠিন। তবে জানা যায় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত মৌলভী আব্দুল আলী চৌধুরী প্রণীত 'মওলুদ শরীফ' গ্রন্থটি প্রাচীনতম।[৪৫]

বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক 'মওলুদ শরীফ' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন, আব্দুল আলী চৌধুরী (১৮৭৪); গোলাম মৌলা সিদ্দিকী (১৮৯৬); মীর

মশাররফ হোসেন (১৯০২); সৈয়দ নওয়াব আলী (১৯০৫); ইবরাহীম খাঁ; সৈয়দ আবুল হোসেন (১৯২৪); খাঁন বাহাদুর আবেদ আলী; মোহাম্মদ শামছুদ্দিন; খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ প্রমুখ। এছাড়াও আব্দুল করিম ও উমর শাহ রচনা করেন 'মাহফিল নামা' (১৮৭৫); নঈমুদ্দীন আহমেদ 'জলসায়ে মৌলুদ'; কফিল উদ্দিন সিদ্দিকী, 'মজমুয়া মৌলুদে সিদ্দিকী' (১৯২৩); খান বাহাদুর তসলিমুদ্দিন আহমদ 'মৌলুদ নাফিসা' (১৯২৬) রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় যে ইসলামী সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে তার স্থূলতা বৃদ্ধি করেছে প্রিয়নবী (সা) এর সীরাতগ্রন্থ এবং অসংখ্য না'ত, গযল ও কবিতা। নবী প্রশস্তিমূলক না'ত, গযল ও কবিতার সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বাংলা লোকসাহিত্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য না'ত, গজল। লালন শাহ, দুদ্দুশাহ, পাঞ্জু শাহ, হাছন রাজাসহ এদেশের মরমী কবিদের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে না'ত।[৪৬]

বাংলা নাটকে রাসূল (সা)

নবী করীম (সা)-এর জীবনের কোন কোন অধ্যায়কে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'ধর্মবীর মুহাম্মদ ১ম, ২য় খণ্ড' (১৮৮৬); মীর আজিজুর রহমানের 'মহানবী' (১৯৪৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৭]

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে রাসূল (সা)

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত ভাষাতেই লেখা হয়েছে।[৪৮] ঐ সব গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকখানা বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। যেমন অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনূদিত সায়্যিদ আমির আলীর *The Spirit of Islam*. মুহিউদ্দিন খান অনূদিত আবুল কালাম আযাদের 'জীবন সায়াহ্নে মানবতা রূপ', 'সাহরাতে ফুটলরে ফুল'; মাজহার উদ্দীন আহমদ অনূদিত আবুল আলা মওদুদীর 'বিশ্বনবীর তিরোভাব', নুরুদ্দীন আহমদ অনূদিত আবুল কালাম আযাদের 'বিশ্বনবীর ওফাত', আব্দুল জলিল অনূদিত সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর 'রহমতে আলম', মুজিবুর রহমান অনূদিত আযাদ সুবহানীর 'বিপ্লবী নবী', মঈনুল ইসলাম অনূদিত আহমদ ইয়ার খানের 'সালতানাত-ই মোস্তফা', আব্দুল্লাহ্ বিন সায়িদ জালালাবাদী অনূদিত সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর 'নবী চিরন্তন', মুহাম্মদ ইউসুফ আলী অনূদিত সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর 'নবুয়্যতে মোহাম্মদী', আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর 'পয়গামে মুহাম্মদী', শাহ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ অনূদিত কারামত আলী জৌনপুরীর

'নূরে মোহাম্মদী', কে, এম; জি, রহমান অনূদিত আশরাফ আলী থানভীর 'খাতেমুল আম্বিয়া', আব্দুল জলিল অনূদিত ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিবের 'নবী ভাস্কর', আখতার ফারুক অনূদিত শিবলী নোমানী ও সোলায়মান নদভীর 'সীরাতুন্নবী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাভাষায় আরো অগণিত আরবি, উর্দু, ফারসি, ইংরেজি ভাষায় প্রণীত সীরাত সাহিত্যের গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বিশ্বনবী (সাঁ)-এর প্রাসঙ্গিকতা

যে সব সাহিত্য গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত মৌলুদ, দরুদ, না'ত, একক গদ্য সাহিত্য, পদ্য-সাহিত্য, নাটক, সমালোচনা সাহিত্য, পুঁথি-সাহিত্য ও হাদীসের আওতায় পড়েনা, এগুলোতে রাসূলে খোদার জীবনীর প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও পর্যালোচনামূলক বিবরণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পার্শ্ব-আলোচনা পাওয়া যায়।[৪৯] এক্ষেত্রে আব্দুল গফুরের 'খায়ের বরকত', মুহাম্মদ সমীরুদ্দীনের 'এসলাম তরণী', আব্দুল রশিদ তর্কবাগীশের 'শেষ প্রেরিত নবী', মুবারক আলীর 'মরু নির্ঝর', এস,এম, ইসহাকের 'পয়গম্বর সহধর্মিনী', মুহম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফীর 'নবুওতে মোহাম্মদী', বন্দে আলী মিয়ার 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন', সিদ্দিক আসাদের 'খতমে নবুওত', ফৌজুল আজিম ও মীর আনোয়ার আহমদের 'জামানে মোহাম্মদী', ইসমাইল হু'সাইনের 'হিন্দু শাস্ত্রে শেষ নবী', সাঈদ ইবনুল কাদেরের 'ইসলামের ক্রমবিকাশ', আবুল খায়ের মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌র 'নবী দর্শন', মুহাম্মদ আবিদ আলীর 'মহানবীর জীবন দর্শন ও দাম্পত্য জীবন', সা'দ আহমাদের 'হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত ও আজকের মুসলমান', বেনজীর আহমদের 'খাতামুন নাবীয়ীন', সাঈদ ইবনুল কাদিরের 'হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পরিবারবর্গ', কাজী রোজীর 'মহানবীর জীবন সঙ্গিনী', আব্দুল জলিলের 'গৌরবময় যুগের ইসলাম', আসকার ইবনে শায়খ-এর 'মহাবিজয়', আব্দুল গণী খানের 'ধরার নবী', আব্দুল মান্নান ও মাসুদ আলীর 'সত্য সমুজ্জ্বল', ইসমাঈল হুসাইন দীনাজীর 'কলিক অবতার ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)', আব্দুল মতিন সালাফীর 'রাহমাতুল লিল আলামীন', আফজাল চৌধুরীর 'ঐতিহ্য চিন্তা ও রাসূল প্রশস্তি', আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের 'সোনালী দিনের কাহিনী', কাজী মোতাহার হোসেনের 'মহানবী ও দুই খলিফার গল্প' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত সংকলন ও সাময়িকী

বর্তমানে সীরাত স্মরণিকার মাধ্যমে অনেক সীরাত সাহিত্য রচিত হয়। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (পত্র-পত্রিকার জগৎ ছাড়াও) সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত সংকলন

ও সাময়িকী বের করে থাকে। এর প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৯৬২ সনে। তার উপর ভিত্তি করে আরো সীরাত সংক্রান্ত অনেক পত্রিকা বের হয়। যেমন,

মাসিক মদীনা	সম্পাদক	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
তরজুমান	সম্পাদক	মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন
জাহানে নও	সম্পাদক	মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
তাহজীব	সম্পাদক	মহিউদ্দীন শামী
বিশ্বনবী স্মরণিকা	সম্পাদক	মহিউদ্দীন আহমদ। (নারায়ণগঞ্জ)
মহানবী স্মরণিকা	সম্পাদক	আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী
মহানবী স্মরণিকা	সম্পাদক	সালাহ উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর
সিরাজাম মুনিরা	সম্পাদক	মঈনুল ইসলাম
সীরাত মোবারক	সম্পাদক	নুরুদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশ সীরাত মিশন)
সীরাত স্মরণিকা	সম্পাদক	আখতার ফারুক (ঢাকা শহর সীরাতুন্নবী কমিটি)
আত্তাওহীদ	সম্পাদক	মোহাম্মদ হারুন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা	সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
অগ্রপথিক	সম্পাদক	সৈয়দ আশরাফ আলী
মাসিক মঈনুল ইসলাম	সম্পাদক	আহমদ শফী (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম)
মাসিক সালাফী	সম্পাদক	মোহাম্মদ আহসান
মাসিক আল বায়্যিনাত	সম্পাদক	দিলুর রহমান (রাজার বাগ, ঢাকা)
মাসিক দ্বীনে হানীফ	সম্পাদক	আব্দুল মতীন জালালাবাদী
মাসিক দাওয়াতুল হক		চট্টগ্রাম
মাসিক মোহাম্মদী		ঢাকা

এমনিভাবে দেখা যায়, বাংলা সীরাত সাহিত্যের উৎপত্তি থেকে বর্তমান অবধি রাসূল (সা)-এর জীবনের উপর বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে। যার ফলে সীরাত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে একটি মজবুত ও সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছে। এ সাহিত্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব বিশ্বনবী (সা)-কে নিয়ে লেখার আগ্রহ বিশ্বের

১৯ মোবাশ্বের আহমদ, *বাংলা ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা)*-এর উপর প্রকাশিত প্রকাশনার গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৮৫, মুখবন্ধ, পৃ. ১

২০ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পুঁথি পরিচিতি: *আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, ভূমিকা, পৃ. ২

২১ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৭। ড. মযহারুল ইসলাম, *লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস*, পৃ. ২১৯

২২ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২রা মে, ১৯৮৬, পৃ. ৪

২৩ ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৮

২৪ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২৫ ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২৬ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, 'এক নজরে বাংলাদেশে ইসলাম', সোনার বাংলা, সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা, ১৪০১ হি, পৃ. ৫৭

২৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলায় ধর্মসাহিত্য*, ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮৮ বাংলা, ভূমিকা, পৃ. ৬

২৮ দিল আফরোজ কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২৯ দিল আফরোজ কাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩০ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *শূন্যপুরাণ*, কলিকাতা, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬ বাংলা, পৃ. ২৩৫

৩১ গোলাম সাকলায়েন, *একের ভিতর পাঁচ*, (৩য় খণ্ড), বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ১৯৮৫, পৃ. ১৮০

৩২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩৩ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৩৪ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-৫২

৩৫ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৫৫

৩৬ প্রাচীন কালে অনেক কবি সাহিত্যিকই হামদ ও না'ত দিয়ে লেখার শুরু করতেন। যেমন,

"মোহাম্মদ বড় নাম ত্রিভুবন সার
আদি অন্ত মোহাম্মদ মহিমা অপার'

(দৌলত উজীর, ইমাম বিজয়)
"নিজ সখা মুহাম্মদ প্রথমে সৃজিল
সেই সে জ্যোতিমূলে ভূবন নির্মিল।"
(*আলাউল, পদ্মাবতী*)
পয়গাম্বর করিয়া যারে সফিউল উম্মত
যার পরে খতম করিল নবুয়ত।
(সৈয়দ হামজা, হাতেম তাঈ)
"দ্বিতীয় প্রণাম করি রসূল খোদার
নূর মুহাম্মদ বলি জগত প্রচার"
(সৈয়দ সুলতান, *শব-ই মিরাজ*)

৩৭ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-০১

৩৮ বাংলা গদ্য সাহিত্যে মহানবী (সা)-এর উপর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪০০টির সন্ধান পাওয়া যায়।

৩৯ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৪০ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪১ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫

৪২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৪৩ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪৪ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৪৫ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৪৬ হাসান আব্দুল কাইউম, বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নবী (সা), সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪০৭ হি., পৃ. ৪১

৪৭ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৪৮ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, প্রাগুক্ত. পৃ. ২

৪৯ মোবাশ্বের আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৫০ উদ্ধৃত: সাইয়েদ সুলায়মান নদভী; খুৎবাতে মাদ্রাজ, বিহার, ১৯২৫, পৃ. ৬১